শিল্পীর পরিচয়

চিত্তরঞ্জন মাইতি

[লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় যেসব ঘটনা বা চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'আমার দেশ, আমার স্বজন' শীর্ষক কাহিনিগুলির মধ্যে। প্রবল পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে যে সমাজ তার সামনে আলোকবর্তিকার মতো তুলে ধরা হয়েছে সনাতন ভারতের স্বরূপ। সত্যের আধারে কাহিনিগুলি পরিবেশিত হলেও সাহিত্যিকের সরস উপস্থাপনাকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। জীবনের শিক্ষা ও পাঠের স্বাদুতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অশীতিপর সাহিত্যিকের এই মর্মস্পর্শী রচনাগুলিতে। আশা করি, নিবোধত-র পাঠকগোষ্ঠীর কাছে লেখাগুলি সমাদর লাভ করবে।—সঃ]

''মা এসেছেন বীণাপাণি আয় রে ছুটে আয়,
হলুদ গাঁদার ফুল ফুটেছে ঘরের আঙিনায়।
শ্বেতপদ্মে বসেছেন মা শ্বেতমরালে পা
মোহনবীণায় সুর উঠেছে আয় রে দেখে যা।''

কণ্ঠটি সুরেলা। আবৃত্তির মতো করে বলে যাচ্ছে কথাগুলি। সুর হয়ে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। হঠাৎ মাতৃবন্দনা থামিয়ে সে হেঁকে উঠল, ''প্রতিমা চাই গো—প্রতিমা?'' হাঁকতে হাঁকতে সে গলিপথে আমার জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

দুদিন পর সরস্বতীপুজো। গড়িয়াহাট মার্কেটের দিকে যেতে বাঁদিকের ফুটপাথ ভরে গেছে সরস্বতীমূর্তিতে। প্রতিমাশিল্পীরা ছোটোবড়ো বহু মূর্তি জড়ো করেছে, কেনাবেচা চলছে জোরকদমে।

বউটির বয়স বিশ বছরের বেশি হবে না। কপালে বড়ো লাল সিঁদুরের টিপ, মুখখানা সকরুণ। মাথায় একটিমাত্র সরস্বতীমূর্তি নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে চলেছে।

* * *

চিরদিনই আমি মূর্তিপাগল মানুষ। মূর্তির আকর্ষণে প্রতিবছর পুরীতে হাজির হতাম। প্রায় পনেরো বছর ধরে আমি পুরী যাতায়াত করছি। সমুদ্রের আকর্ষণে নয়, যেতাম পাথুরিয়াসাহীতে। সেখানে বেশ কয়েকজন মূর্তিশিল্পীর বাস। তাঁরা পুরুষানুক্রমে পাথর খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ করেন। অধ্যাপক নির্মল বসু মশায়ের কাছ থেকে এক প্রস্তরশিল্পীর সন্ধান পেয়েছিলাম। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে যখন অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শেখাতেন তখন উড়িষ্যার এক মূর্তিশিল্পীকে পাথরের কাজ শেখাবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পুত্রেরা পিতার পথ অনুসরণ করে বিখ্যাত প্রস্তরশিল্পী হয়ে ওঠেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধর মহাপাত্র এলাহাবাদ আর্ট কলেজে মূর্তিশিল্পের অধ্যাপক ছিলেন। তখন অসিত হালদার মশায় ছিলেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ।

আমি পাথুরিয়াসাহীতে যেতাম শ্রীধর মহাপাত্রের মেজোভাই ভুবনেশ্বর মহাপাত্রের কাছে। এঁরা দুই ভাই-ই প্রস্তরশিল্পী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বর্ণপদকবিজয়ী। আমি প্রথম যেদিন ভুবনেশ্বরবাবুর খোঁজ করে তাঁর বাড়ি যাই, মানুষটিকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো একটি ছোট্ট চাতালের ওপর বসে তিনি পাথর খোদাই করছিলেন। মাথার ওপর খড়ের চাল। মানুষটি ছোট্ট একটি কাপড় পরে আদুড় গায়ে বসেছিলেন। হাতের ছেনি-হাতুড়ি চলছিল। রোগা, কালো, লম্বা মানুষটি প্রায় কুঁজো হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাঁর একটি

চোখ সম্পূর্ণ সাদা। মনে হল বসন্তে চোখটির দৃষ্টি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আর একটিমাত্র চোখে তিনি প্রায় অসাধ্যসাধন করে চলেছেন। উনি আমার সাড়া পেয়ে দুচোখ মেলে তাকালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে নমস্কার করলাম। পাশে পেতলের পিকদানিতে পানের পিক ফেলে আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, ''প্রফেসর নির্মল বোসের মুখে আপনার কাজের খুব প্রশংসা শুনেছি, তাই এসেছি, দু-একটি মূর্তি পাওয়ার আশায়।''

''কেমন আছেন নির্মলবাবু?''

জানালাম, মাস দুয়েক আগে দেখা হয়েছে, ভালোই আছেন। শিল্পী ছোট্ট দরজার ভিতর দিয়ে অন্দরমহলে চলে গেলেন। সামান্য সময় পরে একখানি মাদুর এনে উলটোদিকে তাঁর মুখোমুখি বিছিয়ে দিয়ে বললেন, ''আসুন ওপরে।'' তিনধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলাম। বসার আগে আমি ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। উনি আমার দুটো হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। বললাম, ''আপনার হাতের তৈরি কোনও মূর্তি কি আছে?'' উনি ভিতরে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একফুট উচ্চতার একটি মূর্তি তুলে নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে দিয়ে বললেন, ''আপাতত এইটি আছে।'' দেখলাম, মূর্তিটি সফট্ স্টোনে তৈরি। রাখালরাজ কৃষ্ণের মূর্তি। গাছতলায় বাঁশি বাজাচ্ছেন, পাশে একটি নধরকান্তি গোবৎস। পুরীর বাজারে আগে ঘুরে ঘুরে দেখেছি, কিন্তু কোনও মূর্তিই তেমন পছন্দ হয়নি। এ মূর্তিটি দেখেই বুঝলাম, যথার্থ ভাস্করের খোঁজই নির্মলবাবু আমাকে দিয়েছেন।

মূর্তিটি সেদিন ওঁর কাছ থেকে আমি কিনে নিয়ে এসেছিলাম। ফিরে আসার দিন সকাল দশটা নাগাদ উনি আমার হোটেলে এসে ট্রাঙ্কের ভিতর মূর্তিটি কাপড় জড়িয়ে প্যাক করে দিয়েছিলেন যাতে আঘাত লেগে ভেঙে না যায়।

এরপর দীর্ঘ পনেরো বছরের যাত্রা। কত মূর্তি যে আমি তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। বেলেপাথর, চুনাপাথর, কালো মসৃণ পাথর আর লাল পাথরের সব মূর্তি। সেসব মূর্তির কিছু বিশিষ্ট মানুষদের উপহার দিয়েছি, বেশ কয়েকটি বাড়িতে রেখেছি। মূর্তির চারদিকে কাঠের ফ্রেম করে তার সৌন্দর্য বাড়াবার চেষ্টা করেছি।

জগন্নাথ মন্দির, রাজারানি মন্দির, ভুবনেশ্বর আর কোনারক মন্দিরে কতবার যে মূর্তির খোঁজে ছুটেছি তার ঠিক নেই। আমার পছন্দের মূর্তিগুলিকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরাবন্দি করেছি। মৃদঙ্গবাদিনী, মুরলিবাদিনী, মন্দিরাবাদিনী মূর্তিগুলি অপূর্ব ভঙ্গিতে উৎকীর্ণ। লীলাভরে কপোলে করবিন্যাস করে দাঁড়িয়ে আছে মোহময়ী কন্যারা। বিশাল সব মূর্তি। হস্তিপৃষ্ঠে হাওদায় বসে চলেছেন রাজারানি। কী অপরূপ গজেন্দ্রগমন! সবকটি মূর্তিই নিখুঁত দক্ষতায় উৎকীর্ণ করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী ভুবনেশ্বর মহাপাত্র।

কয়েকবছর পর তাঁর অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। শিল্পীর স্ত্রী আমাকে অপত্যস্নেহে অভিষিক্ত করেছিলেন। পুত্রসন্তান ছিল না তাঁর। তিনকন্যা নিয়ে সংসার। বড়ো মেয়েটিকে আমি 'দিদি' বলে ডাকতাম। পাশের বাড়িতেই তাঁর বিয়ে হয়েছে। তাঁর স্বামীও মূর্তিশিল্পী। দরকারমতো ভুবনেশ্বরবাবু তাঁর মেয়েটিকে পাথরের কাজ শেখান। ছোটো মেয়েটি সংসারী, সম্বলপুরে বাস। স্বামী-পুত্র সহ কাটে তার সুখের সংসার। মেজো মেয়ে রমা বিয়ের ঘোরতর বিরোধী। সে নুলিয়াপাড়ায় একটি প্রাইমারি স্কুলে কাজ করে। কাজ চালাবার মতো পাথরের কাজ জানে রমা। সে স্কুলে যাওয়ার পথে আগে জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে প্রভাতি প্রণাম সেরে নেয়। নুলিয়াপাড়ার বাচ্চাদের সে নানারকম জীবজন্তু, পাখি, ফুল ইত্যাদি তৈরি করে দেয়। ছোটো ছোটো ঝিনুকে অপূর্ব দু-নরীর মালা তৈরি করে নুলিয়া বউদের উপহার দেয়।

শেষবার যখন পুরী যাই তখন ছিলাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। সেবার চিৎপুর থেকে একখণ্ড লাল পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে যাই। আমার কলকাতার বাড়িতে দরজার ওপর বৌদ্ধস্তূপের আকারে একটি ছোট্ট মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলাম। তার ভিতর বসাব বলে ওই লাল প্রস্তরখণ্ডটি নিয়ে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল একটি সূর্যমূর্তি নির্মাণের কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

ভুবনেশ্বরবাবু ওই পাথরে এক হাত পরিমাণ একটি

মৃদঙ্গবাদিনীর অপরূপ মূর্তি তৈরি করে দেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মুখে মনে হবে, মেয়েটি মৃদঙ্গ বাজিয়ে অতিথিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

আমি জানতাম না, সেবছর শেষবারের মতো আমি পুরী যাচ্ছি। প্রতিবারই ভোরে উঠে আমি সমুদ্রদর্শন করতাম। আটটার মধ্যে চলে যেতাম পাথুরিয়াসাহীতে শিল্পীর বাড়ি। সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চলত মূর্তি নির্মাণের কাজ। তারপর আমার আস্তানায় ফিরে আসতাম। স্নান-খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপর চারটে বাজলেই শিল্পীর বাড়িতে হাজির। বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ হত।

তবে প্রতিবারই আমি লক্ষ করেছি, ঠোঁটের বিশেষ ভঙ্গি কিংবা চোখের টান আমার সামনে তিনি দিতেন না। রাতে কখন যে একান্তে ধ্যানের মধ্যে শেষ করে রাখতেন তা পনেরো বছরেও আমার অগোচর ছিল।

সেবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। শিল্পীর বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মেঘ কেটে অপরূপ এক আলোর ঝিলিক দেখলাম। অবশ্য সে আলোতে তীক্ষ্ণতা ছিল না, ছিল দিনান্তের স্নিগ্ধতা। শিল্পী বললেন, ''কাল সন্ধ্যায় তো দেশে ফিরছেন?'' আমি করুণ মুখ করে মাথা নাড়লাম। প্রতিবছর আমি ফেরার সময় উনি মূর্তি নিয়ে এসে আমার ট্রাঙ্কে প্যাক করে রেখে দিয়ে যেতেন।

আগের দিন সন্ধ্যায় আমার মৃদঙ্গবাদিনী মূর্তিটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি আশ্রমে ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ভুবনেশ্বরবাবু বললেন, ''আপনাকে একটা ছোটো মূর্তি দেখানোর ইচ্ছে ছিল। আজই ভুবনেশ্বর এগজিবিশন থেকে মূর্তিটি দিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও এল না কেন ভাবছি।'' বললাম, ''বিশেষ দর্শনীয় মূর্তি নিশ্চয়!''

শুনলাম, সফট্ স্টোনের ছোটো মূর্তি। তন্ময় বিরহিণী দূরে কর্মরত প্রেমিকের উদ্দেশে পত্ররচনা করছে। বহুখ্যাত মূর্তিটি 'পত্রলেখা' নামে পরিচিত। মূর্তিটি খাজুরাহোর মন্দিরে প্রথম দেখা যায়। উড়িষ্যার মন্দির-ভাস্কর্যের দেহভঙ্গিমা এতে নেই। শিল্পকর্মটির ছোট্ট একটি রেপ্লিকা তৈরি করেছেন ভুবনেশ্বরবাবু। তাঁর মূর্তিটি ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঁচ-পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। একথা শুনে মূর্তিটি দেখার প্রবল লোভ আমি সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু মেঘ নেমে আসছে দেখে পা বাড়ালাম পথের দিকে।

সবে বড়ো রাস্তায় পা দিয়েছি। পিছন থেকে রমাদিদি দৌড়ে এসে বলল, ''দাদা, আপনাকে বাবা ডাকছেন।'' ফিরে গিয়ে দেখি ভুবনেশ্বর থেকে একটি লোক এসে ইতিমধ্যে শিল্পীকে তাঁর মূর্তিটি দিয়ে গেছে। মূর্তিটি দেখলাম। কতক্ষণ যে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মনে নেই। একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কান্তিময়ী কন্যাটি তদ্‌গত নিষ্ঠায় পত্ররচনা করছে। এমন নিখুঁত শিল্পকর্ম এর আগে আমি কখনও দেখিনি। ভুবনেশ্বর মহাপাত্র যে কত বড়ো শিল্পী তা এই মূর্তিটি না দেখলে আমি বুঝতে পারতাম না। ধ্যানভঙ্গ হলে বললাম, ''এ মূর্তি আমাকে আপনি না দেখালেও পারতেন। সারাজীবন না পাওয়ার দুঃখ বইতে হবে।''

উনি বললেন, ''প্রতিটি এগজিবিশনে বিশিষ্ট শিল্পবোদ্ধারা এই মূর্তিটি বহুমূল্যের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি এই মূর্তিটিকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। কোনও প্রলোভনের কাছেই নিজেকে বিক্রি করিনি। যখন আমি এই মূর্তিটি রচনা করি তখন আমার বাইশ বছর বয়স। রাতদিন মগ্ন হয়ে এই কাজটুকু করে গেছি। আজ শত চেষ্টা করলেও এরকম অঙ্গসজ্জার কাজ, এমন তদ্‌গত মুখভঙ্গি আমি দ্বিতীয় আর একটি রচনা করতে পারব না।''

সেদিন আশ্রমে ফিরে এলাম। পরদিন যথারীতি কাপড়ের টুকরো আর কাগজে মুড়ে আমার মূর্তি নিয়ে এলেন শিল্পী। তাঁর জন্য ট্রাঙ্কের ডালাটা খুলেই রেখেছিলাম। তিনি আমার কাপড়-চোপড়ের ভিতর সাবধানে মূর্তিটিকে রাখলেন। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল আরও কী একটা জিনিস যেন তিনি কাপড়ে ভালো করে জড়িয়ে রাখছেন! কৌতূহলী হয়ে বললাম, ''ওটা কী রাখছেন?'' ভুবনেশ্বরবাবু হঠাৎ রসিকতা করে বলে উঠলেন, ''আমার সব থেকে প্রিয় কন্যাকে আজ আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে আমি একেবারে চিন্তামুক্ত হলাম।'' আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি সহাস্যে ও সযত্নে পরতে পরতে কাপড়ের ভাঁজ খুলে একটি ছোটো মূর্তি

বের করে আমার সামনে তুলে ধরলেন। কালকের সেই অমূল্য মূর্তি! চোখ অশ্রুসজল কিন্তু মুখে তৃপ্তির হাসি শিল্পীর। আমি বললাম, ''এর জন্য যে অর্থমূল্য আমাকে দিতে হবে তা তো আমার কাছে নেই।''

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন, ''আগেই তো আপনাকে বলেছি, লক্ষ টাকাতেও এ মূর্তি আমি এগজিবিশনে বিক্রি করতে পারব না। তা আমি করিওনি। আমার ছেলে নেই, আপনিই আমার সন্তান। পনেরো বছর ধরে আপনি এসে আমার কাছে বসে মূর্তিগড়া দেখেছেন। আপনি যে কত বড়ো মূর্তিপাগল মানুষ তা বুঝতে আমার বাকি নেই। আমি জানি এ মূর্তি আপনাকে দিলেই আমি শান্তি পাব। এর জন্য একটি পয়সাও আপনাকে দিতে হবে না।''

আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। বললাম, ''শুধু একটি প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। আজ আপনাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে চাই। আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করুন, সারাজীবন যেন আমি শিল্পকে ভালোবেসে যেতে পারি।''

ভাস্কর ভুবনেশ্বর মহাপাত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম। অতি শৈশবেই আমার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হলাম। আর কোনওদিন আমি পুরী যাইনি।

* * *

নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। সংবিৎ ফিরে পেয়ে জানালার বাইরে তাকালাম। সরস্বতীপ্রতিমা বিক্রি করতে এসে মেয়েটি সম্ভবত বুঝতে পারেনি যে একজন প্রায়-পাগল লোকের পাল্লায় সে পড়েছে।

দেখলাম সে চলে যাওয়ার জন্য অন্যদিকে ফিরেছে। বললাম, ''আমার বাড়িতে মাটির একটি সরস্বতীমূর্তি আছে। প্রতিদিন সেই মূর্তি আমার ঠাকুরঘরে পুজো পান। প্রতি বছর সরস্বতীপুজোর আগে তার নতুন কলেবর হয় আর ধুমধাম করে ওই মূর্তিকেই পুজো করি।'' আমার দরকার নেই বুঝে সে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছিল, জানতে চাইলাম, ''কত দাম তোমার মূর্তির?''

''একশো টাকা।''

আমি ব্যাগ থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, ''এ টাকাটা তুমি নিয়ে যাও, তবে খুব সুন্দর হলেও ও মূর্তিটি আমি বাড়িতে রেখে দিতে পারব না। তুমি ওটা বিক্রি করে দিয়ো।'' মেয়েটি বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, ''আমি খামোখা টাকা নেব কেন?''

আমি ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম কিন্তু বুঝলাম, এ মেয়ে অযাচিত দান গ্রহণ করে না।

ভুলে গিয়েছিলাম মেয়েটির কথা। বছর দুয়েক এ গলিতে তাকে আর দেখিনি। একদিন পথ পেরিয়ে পূর্ণদাস রোডে ঢুকছি, উলটোদিকের ফুটপাথে একটি মেয়েকে ঝাঁট দিতে দেখলাম। সে মুখ তুলতেই আমার মনে হল, এই সেই মূর্তিবিক্রেতা মেয়েটি। এপারের দিকে তাকাতেই আমি ওর চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কপালে বড়ো সিঁদুরের বিন্দুটি নেই।

মুহূর্তে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমি পথ পেরিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও আমাকে চিনতে পারল কি না বুঝলাম না। বললাম, ''তোমাকে তো আর গান গেয়ে মূর্তি বিক্রি করতে দেখি না?''

ও করুণ চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''মূর্তি যে গড়ত সেই কারিগর আর নেই।''

''তোমার সংসারে আর কেউ নেই?''

ও মাথা নেড়ে জানাল, ঘরে আর কেউ নেই তার। মুখে বলল, এপার ওপার কটা ফুটপাথ সে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে। বেশি ধুলো জমলে জল ঢেলে পরিষ্কার করে দেয়।

খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, কিছু সাহায্য করব বলে হাতটা পকেটে চলে গিয়েছিল। পরক্ষণেই মনে হল, এ মেয়ে দান গ্রহণ করে না, নিজের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে শিখেছে। আমি মনে মনে আমার চেয়ে অনেক ছোটো মেয়েটিকে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে চললাম।

কাজ শেষে ফেরার পথে দেখি, ফুটপাথ-লাগোয়া একটা ইঁট বের করা দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে একটুকরো পাউরুটি চিবোচ্ছে। এটুকু তার পরিশ্রমের পুরস্কার।

ভারতের সহায়সম্বলহীন অগণিত মেয়ের মুখ আমি সেই আত্মমর্যাদাপূর্ণ মেয়েটির মুখের মধ্যে দেখতে পেলাম। ✠